বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যঃ তত্ত্ব এবং বাস্তবতা

খন্দকার আব্দুল মোত্তালেব*

Foreign Trade of Bangladesh: Theory and Reality

Abstract

Bangladesh was mainly an import dependant country. The import trade fulfilled most of its development demand and necessary demand. Recently Bangladesh has emerged as an exporting country though its export earnings are still not enough even to cover the import payment. In this article the foreign trade structure of Bangladesh has been discussed in the light of the well-established trade theories. It is found that the country is exporting labour intensive goods and importing mainly capital-intensive goods. The major trade partner of the country and their share in export and import trade has also been highlighted in this article. In the last part of the article the recent problem of the export trade has been explained. According to the findings Bangladesh import more from its neighbors i.e. India, Singapore, Hong Kong and export more to EU and USA. It is found that the incidents of September 11, 2001 and the Afghan-US led force war have seriously affected the major exportables of the country. This matter has been discussed and in conclusion some recommendation and suggestions have been made to overcome the current impasse.)

১.০ ভূমিকা

বর্তমানে সারা বিশ্বে মুক্ত বাণিজ্যের হাওয়া বইছে। মুক্ত বাণিজ্যের এই যাত্রা কিন্তু শুধুমাত্র গ্যাট কিংবা তার উত্তরসূরী ডব্লুটিও'র হাত ধরে শুরু হয়নি। গ্যাট এবং ডব্লুটিও'র অনেক আগে অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো , ডেভিড হিউম প্রমুখ চিন্তাবিদগণ মুক্ত বাণিজ্যের স্বপক্ষে তাদের মূল্যবান মতামত তুলে ধরেছিলেন। এ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো মুক্ত বাণিজ্যের স্বপক্ষে তাদের বিখ্যাত তত্ত্ব প্রদান করে বলেছেন কম সরকারি হস্তক্ষেপ (laissez-faire) এবং মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে অপ্রচুর উৎপাদনের উপকরণের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে পারস্পরিক লাভজনক অবস্থানে পৌছানো সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত এ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বটি চরম সুবিধা তত্ত্ব (Absolute Advantage Theory) এবং ডেভিড রিকার্ডোর তত্ত্বটি তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব (Comparative Advantage Theory) নামে পরিচিত।

২.০ বাণিজ্যবাদী ধারণা

১৭৭৬ সালে এ্যাডাম স্মিথের 'The Wealth of Nations' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সময়ে বিশ্বে বিশেষ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত বাণিজ্যবাদী (Merchantalism) ধারণার প্রচলন ছিল।

---

* গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

এই ধারণার ধারক এবং বাহক ছিলেন তৎকালীন বণিক, ব্যাংকার, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ এমনকি একদল দার্শনিকও।[১] এই বাণিজ্যবাদীরা মনে করতেন একটি দেশ শুধুমাত্র স্বর্ণ মজুত বৃদ্ধি করে এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ধনী এবং উন্নত হতে পারে। তাঁরা মনে করতেন যে, শক্তিশালী সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশ্বব্যপী আদৃত ধাতু স্বর্ণ মজুত বৃদ্ধি একমাত্র বাণিজ্য উদ্বৃত্তের মাধ্যমেই সম্ভব। সে জন্য বাণিজ্যবাদীরা উচ্চমূল্যে প্রচুর রপ্তানী এবং আমদানী কমানোর জন্য উচ্চহারে আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক আরোপের পক্ষপাতি ছিলেন। এমনকি তাঁরা রপ্তানী পণ্যের সহজ বাজারের জন্য এবং কাঁচামালের যোগানের জন্য পরদেশ দখলকেও (Colonization) সমর্থন দিতেন।[২] এই বাণিজ্যবাদীরাই আন্তর্জাতিক বাণ্যিজ্যের লেন-দেন ভারসাম্যে অনুকূল (Favourable) এবং প্রতিকূল (Adverse) শব্দের ব্যবহার শুরু করেন।[৩]

৩.০ স্বীকৃত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বসমূহ

বাণিজ্যবাদীদের এই ধারণার মূলে এ্যাডাম স্মিথ কুঠারাঘাত করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, কোন দেশের পক্ষে ক্রমাগতভাবে আন্তর্জাতিক বাণ্যিজ্যের লেন-দেন ভারসাম্য অনুকূল রাখা সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নেই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন হয় এবং তা কিভাবে বাণিজ্যরত দেশগুলিকে সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে তা তিনি এবং তাঁর যোগ্য অনুসারী ডেভিড রিকার্ডো তাঁদের তত্ত্বের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এই তত্ত্বের মাধ্যমে এমনকি কিভাবে আমদানী বাণিজ্যের মাধ্যমেও লাভবান হওয়া যায় সেটার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

৩.১ এ্যাডাম স্মিথের চরম সুবিধা তত্ত্ব

এ্যাডাম স্মিথ তাঁর তত্ত্বে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে laissez-faire অর্থনীতি এবং মুক্ত বাণিজ্য অবস্থায় বাণিজ্যের মাধ্যমে আমদানীকারক এবং রপ্তানীকারক উভয় দেশই লাভবান হবে। একটি গাণিতিক উদাহরণের মাধ্যমে এ্যাডাম স্মিথের Absolute Advantage Theory ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । মনে করি, দুটি দেশ ক এবং খ দুটি দেশই দুটি পণ্য উৎপাদন করে যথা: ধান ও কাপড় । এছাড়া অন্যান্য শর্তাবলী হলো বিশ্বে মুক্ত বাণিজ্য অবস্থা বিরাজমান। এখন সারণী-১ এ লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, ক ১ শ্রম-ঘন্টা সময় ব্যয় করে ৬ বস্তা ধান অথবা ৪ গজ কাপড় উৎপাদন করতে পারে। অন্যদিকে খ ১ শ্রম-ঘন্টা সময় ব্যয় করে ১ বস্তা ধান অথবা ৫ গজ কাপড় উৎপাদন করতে পারে। এই উদাহরণ থেকে এটা স্পস্ট যে, ধান উৎপাদনে খ এর তুলনায় ক এবং কাপড় উৎপাদনে ক এর তুলনায় খ, এর চরম সুবিধা বিরাজিত। এখন চরম সুবিধা তত্ত্ব অনুযায়ী ক ও খ এর মধ্যে বাণিজ্য হলে দুটি দেশ চরম সুবিধা অনুযায়ী দুটি পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত হবে। ক ধান

১.Diminick Salvatore, *International Economics* (New York: Macmlan Publishing Company, 1983). পৃঃ১৪।

২. Walter Enders and Harvey E. Lapan, *International Economics: Theory and Policy,* (New Jersy: Prentice Hill, Inc., 1987), পৃঃ ২৫।

৩। পূর্বোক্ত।

উৎপাদনে বিশেষীকরণ করবে অর্থাৎ বেশী ধান উৎপাদন করে তা খ দেশে রপ্তানী করে সেখান থেকে কাপড় আমদানী করবে এবং একইভাবে খ কাপড় উৎপাদনে বিশেষায়ীত করে তা ক দেশে রপ্তানী করে ক থেকে ধান আমদানী করবে।

সারণী- ১
চরম সুবিধা তত্ত্ব

দ্রব্য	ক	খ
ধান (বস্তা/শ্রম-ঘন্টা)	৬	১
কাপড় (গজ/শ্রম-ঘন্টা)	৪	৫

সারণী-১[৪] এ দেখা যায় যে ক দেশে ধান ও কাপড়ের আভ্যন্তরীণ দাম ৬:৪ অর্থাৎ ৬ বস্তা ধানের বিনিময়ে ৪ গজ কাপড় পাওয়া যায়। এখন যদি বাণিজ্যের মাধ্যমে ৬ বস্তা ধানের বিনিময়ে ৪ গজের বেশী কাপড় পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে ক দেশের জন্য লাভজনক। একইভাবে খ দেশে ধান ও কাপড়ের আভ্যন্তরীণ দাম ১:৫ অর্থাৎ ১ বস্তা ধান পাওয়া যায় ৫ গজ কাপড়ের বিনিময়ে। এখন যদি বাণিজ্যের মাধ্যমে ৫গজ কাপড়ের বিনিময়ে ১ বস্তার বেশী ধান পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে খ দেশের জন্য লাভজনক।

ধরি, ক ৬ বস্তা ধানের বিনিময়ে খ দেশ থেকে ৬ গজ কাপড় আমদানী করে। তাহলে ক দেশের লাভ হল ২গজ কাপড় বা ১/২ শ্রম ঘন্টা সাশ্রয় হবে। কারণ দেশের অভ্যন্তরে ৬ বস্তা ধানের বিনিময়ে ৪ গজ কাপড় পাওয়া যায়। অন্যদিকে ৬ বস্তা ধান যা খ দেশ ৬গজ কাপড়ের বিনিময়ে আমদানী করল তা খ দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যে ৬ শ্রম-ঘন্টার সমান। যা দিয়ে খ দেশের অভ্যন্তরে (৫x৬ =৩০) ৩০ গজ কাপড় উৎপাদন করতে পারে। সুতরাং খ ৬ গজ কাপড়ের বদলে ৬ বস্তা ধান ক দেশ থেকে আমদানী করার ফলে ২৪ গজ কাপড়ের সমান অথবা প্রায় ৫ শ্রম-ঘন্টা বাঁচাতে পারছে যা দিয়ে খ দেশ আরও কাপড় উৎপাদন করে আরও ধান আমদানী করতে পারবে। সুতরাং বাণিজ্য হলে উভয় দেশই বাণিজ্যপূর্ব অবস্থা থেকে উন্নততর হবার সুযোগ পাচ্ছে। চরম সুবিধা তত্ত্ব অনুযায়ী একটি দেশ কোন দ্রব্য উৎপাদনে চরম সুবিধা ভোগ করে। যে দেশ যে দ্রব্য উৎপাদনে চরম সুবিধা ভোগ করে সে দেশ সে দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং অন্যদেশ থেকে যে দ্রব্য উৎপাদনে চরম অসুবিধা আছে সে সব দ্রব্য সামগ্রী নিজের চরম সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ে আমদানী করবে । এতে করে বিশ্বে সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং অধিক কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

৪। সারণী-১ এবং ২ Diminick Salvatore এর *International Economics* (New York: Macmilan Publishing Company, 1983) পৃঃ ১৭-১৮ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য শুধুমাত্র দেশের নাম দুটি পরিবর্তন করে ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.২ ডেভিড রিকার্ডোর তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব

অন্যদিকে ডেভিড রিকার্ডো প্রদত্ত তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব অনুযায়ী শুধুমাত্র চরম সুবিধা থাকলেই যে লাভজনক বাণিজ্য সম্ভব তা নয় বরং চরম সুবিধা না থাকা সত্বেও কিভাবে দুটি দেশের মধ্যে লাভজনক বাণিজ্য সংঘটিত হতে পারে তার ব্যাখ্যা করে। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো যদি কোন দেশ অন্য দেশের তুলনায় দুটি দ্রব্য (আমাদের পূর্বের মডেল দুটি দেশ, দুটি দ্রব্য) উৎপাদনের ক্ষেত্রেই কম দক্ষ হয় তারপরও লাভজনক বাণিজ্য সম্ভব যদি অদক্ষ দেশ যে দ্রব্য উৎপাদনে কম অসুবিধা (less disadvantage) বা তুলনামূলক সুবিধা আছে (Comparative Advantage) সে দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষীকরণ করে ও রপ্তানী করে এবং যে দ্রব্য উৎপাদনে বেশী অসুবিধা (More disadvantage) বা তুলনামূলক অসুবিধা আছে (Comparative disadvantage) সে দ্রব্য আমদানী করে। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। সারণী- ২ এ আমরা আমাদের আগের মডেল একটু পরিবর্তিতরূপে ব্যবহার করেছি:

সারণী-২
তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব

দ্রব্য	ক	খ
ধান (বস্তা/শ্রম-ঘন্টা)	৬	১
কাপড় (গজ/শ্রম-ঘন্টা)	৪	২

সারণী-২ এ দেখা যাচ্ছে ক দেশে খ দেশের তুলনায় ধান ও কাপড় উভয় দ্রব্য উৎপাদনে চরম সুবিধা বর্তমান। আর খ দেশে দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রেই চরম অসুবিধা বিরাজমান। কিন্তু আমরা যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব ক দেশে চরম সুবিধা কাপড়ের চেয়ে (৪:২) ধানের ক্ষেত্রে বেশী (৬:১)। অর্থাৎ ক দেশে খ দেশের তুলনায় ধান উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা বর্তমান। আবার খ দেশে দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে চরম অসুবিধা থাকা সত্বেও কাপড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে চরম অসুবিধা কম। এর অর্থ হলো কাপড় উৎপাদনে খ দেশের তুলনামূলক সুবিধা বর্তমান। এ অবস্থায় খ দেশ কাপড় উৎপাদনে বিশেষায়ন করলে এবং ক দেশ ধান উৎপাদনে বিশেষায়ন করলে দুটি দেশই লাভবান হবে।

সারণী-২ এ দেখা যাচ্ছে যে ক দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার মূল্য ৬:৪। অর্থাৎ ক দেশ ৬ বস্তা ধানের বিনিময়ে ৪ গজের বেশী কাপড় আমদানী করতে পারলে সেটা হবে লাভজনক। আবার খ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার মূল্য ১:২। অর্থাৎ খ দেশ ২ গজ কাপড়ের বিনিময়ে ১ বস্তার বেশী ধান আমদানী করতে পারলে সেটা হবে লাভজনক। ধরি ক দেশ ৬ বস্তা ধানের বিনিময়ে ৬ গজ কাপড় খ দেশ থেকে আমদানী করল । এ ক্ষেত্রে ক দেশের লাভ হল ২ গজ কাপড় বা ১/২ শ্রম ঘন্টা সময়। অন্যদিকে খ দেশের ৬ বস্তা ধান উৎপাদন করতে লাগত ৬ শ্রম ঘন্টা । কিন্তু খ দেশ ৬ শ্রম ঘন্টা সময় ব্যয় করে ৬ বস্তা ধান উৎপাদন না করে ১২ গজ

কাপড় উৎপাদন করবে এবং ৬ গজ কাপড়ের বিনিময়ে ৬ বস্তা ধান আমদানী করবে। এর ফলে খ দেশের ৬ গজ কাপড় বা ৩ শ্রম ঘন্টা সময় সাশ্রয় হচ্ছে। অর্থাৎ চরম সুবিধার অবর্তমানে শুধুমাত্র তুলনামূলক সুবিধা বর্তমান থাকলেও লাভজনক বিশ্ব বাণিজ্য সম্ভব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তুলনামূলক সুবিধার পার্থক্যের কারণে দাম পার্থক্যের সৃষ্টি হয় এবং দাম পার্থক্যের জন্যই লাভজনক বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হতে পারে। এখানে একটা ব্যপার লক্ষণীয় যে, অভ্যান্তরীণ দাম পার্থক্য যে দেশের যত বেশী থাকবে সে দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে তত লাভবান হবে। আলোচ্য উদাহরণে খ বেশী লাভবান হবার কারণ হল খ-এর বাণিজ্য পূর্ব অভ্যন্তরীণ মূল্য পার্থক্য ক-এর চাইতে বেশী ছিল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বটি একটি সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যখ্যা করা সম্ভব। ধরা যাক, একজন আইনজীবী যিনি প্রতি ঘন্টায় আয় করেন ১০০ টাকা এবং তার টাইপিং এ গতি মিনিটে ৫০ টি শব্দ । তার একজন মুদ্রাক্ষরিক আছে যার টাইপিং এ গতি প্রতি মিনিটে ২৫ টি শব্দ এবং তার মজুরী প্রতি ঘন্টায় ২০ টাকা। এক্ষেত্রে আইনজীবীর টাইপিং এ চরম সুবিধা থাকা সত্বেও (তার মুদ্রাক্ষরিক এর দ্বিগুণ) আইন ব্যবসাই তার জন্য লাভজনক। কারণ তিনি যদি আইন ব্যবসা বাদ দিয়ে মুদ্রাক্ষরিকের কাজ করেন তবে তিনি আয় করবেন প্রতি ঘন্টায় মাত্র ৪০ টাকা। অপরদিকে তিনি আইন ব্যবসার কাজে নিয়োজিত হলে তার আয় হয় ১০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় তিনি ৬০ টাকা পরিমাণ বেশী আয় করতে পারেন। সেজন্য আইনজীবীর মুদ্রাক্ষরিকের কাজে চরম সুবিধা থাকা সত্বেও তার তুলনামূলক সুবিধা (আইন ব্যবসা) অনুযায়ী আইন ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া হবে লাভজনক ।

৩.৩ উপাদানের প্রাচুর্যতা তত্ত্ব

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই ভিত্তি তুলনামূলক খরচ সুবিধা তত্ত্ব কিন্তু কেন তুলনামূলক খরচ পার্থক্য দেখা দেয়, সেটার কোন ব্যাখ্যা দেয়না । এই তুলনামূলক খরচ পার্থক্য কেন সৃষ্টি হয় তার ব্যখ্যা দিয়েছেন বিখ্যাত সুইডিশ অর্থনীতিবিদ Eli Heckscher এবং তাঁর ছাত্র Bertil Ohlin যা Heckscher -Bertil Ohlin Theory of International Trade বা উপাদানের প্রাচুর্য তত্ত্ব বা আধুনিক বাণিজ্য তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎপাদনের উপকরণ সমূহের যোগান এক রকম নয়। কোন দেশে মূলধনের প্রাচুর্য আছে আবার কোন দেশের শ্রমের প্রাচুর্য আছে। যে দেশের মুলধনের প্রাচুর্য আছে সে দেশ মূলধন নিবিড় দ্রব্য উৎপাদন করবে কারণ এখানেই তার তুলনামূলক সুবিধা থাকবে এবং কোন দেশের শ্রমের প্রাচুর্য থাকলে সে দেশ শ্রম নিবিড় দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং রপ্তানী করবে। অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের প্রাচুর্যের পার্থক্যের কারণে দাম পার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং এই দাম পার্থক্যের জন্যই বৈদেশিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।[৫]

৫। Dominic Salvatore, *International Economics,* প্রাগুপ্ত পৃঃ ৯১-১১০।

৪.০ বাংলাদেশের আমদানী বাণিজ্য এবং বাণিজ্য তত্ত্বসমূহ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই তত্ত্বগুলির নানা রকম সমালোচনা আছে । এখানে সমালোচনাগুলিকে উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই স্বীকৃত তত্ত্বগুলির আলোকে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যখ্যা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

উরুগুয়ে রাউন্ড পরবর্তী বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ তার বৈদেশিক বাণিজ্যকে নানাদিক দিয়ে উদার এবং রপ্তানীমুখী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্প সময়ে আমদানী শুল্কের বড় রকমের হ্রাসের ফলে বিগত অর্থ বছরগুলিতে আমদানীর তুলনায় রপ্তানী অধিক হারে বৃদ্ধি পায় । সারণী -৩ এ একনজরে বাংলাদেশের আমদানী বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থার চিত্রায়ন করা হয়েছে।

সারণী-৩
এক নজরে বাংলাদেশের আমদানী বাণিজ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

প্রধান আমদানী খাত	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০
১.খাদ্য শষ্য চাল গম	২৯৭ -- ২৯৭	২৬৫ ৫ ২৬০	১৭৬ --- ১৭৬	১৫১ ১০ ১৪১	৪৭৬ ২২০ ২৫৬	৫৮৬ ৩৫৮ ২২৮	১৮৪ ২৮ ১৫৬	৩৬৯ ২৪৭ ১২২	৯৯৭ ৬৮০ ৩১৭	৩৮১ ১১৫ ২৬৬
২. খাদ্য ব্যতিত অন্যান্য দ্রব্য	৩১৭৩	৩১৯৮	৩৮১০	৩৯১৯	৫১৬১	৬১০০	৬৫৭৬	৬৬৬২	৬৫২৫	৭৩৫৭
৩. ইপিজেড	৪০	৬৩	৮৫	১২১	১৯৭	২৬১	৪০২	৪৯৩	৪৯৬	৬৬৫
মোট (১+২+৩)	৩৫১০	৩৫২৬	৪০৭১	৪১৯১	৫৮৩৪	৬৯৪৭	৭১৬২	৭৫২৪	৮০১৮	৮৪০৩
শতকরা পরিবর্তন*	৭.৭	১.৩	১৫.৮	২.৯	৩৯.২	১৯.১	৩.১	৫.১	৬.৬	৪.৮

উৎস: বার্ষিক আমদানী ব্যয় ১৯৯৯-২০০০, পৃষ্ঠা XLI
*বাংলাদেশ সরকার, *অর্থনৈতিক জরীপ ২০০১*, পৃষ্ঠা ১৭১

সারণী-৩ এ দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের আমদানী ব্যয় অত্যধিক দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে । এর কারণ হিসেবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে শুল্কহার হ্রাস এবং উদার বাণিজ্য নীতিই এর প্রধান কারণ। তাছাড়া, দেশে ক্রমবর্ধমান শিল্পের চাহিদা মেটানোর জন্যও আমদানী বেড়েছে। গত ১৪ই জুন, ১৯৯৮ সাল থেকে দেশে ৫ বছর মেয়াদী (১৯৯৭-২০০২) আমদানী নীতি কার্যকর করা হয়।[৬] নতুন এই নীতি অনুযায়ী আমদানী নিষিদ্ধ এবং শর্তযুক্ত পণ্যের সংখ্যা ১২১ এ হ্রাস করা হয়েছে এবং ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরের সর্বোচ্চ শুল্কের হার ৪২.৫% থেকে কমিয়ে ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে ৪০% করা হয়েছে। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ আমদানী শুল্ক হার

৬। বাংলাদেশ সরকার, অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১ (ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০০১) পৃঃ ৩৮।

৩৭.৫% এ হ্রাস করা হয়েছে। ফলে আমদানীও বেড়েছে দ্রুত গতিতে। ১৯৯০/৯১ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৭%। ১৯৯৯/০০ আমদানী বাণিজ্যের বৃদ্ধির হার এসে দাঁড়ায় শতকরা ৪.৮ ভাগে।

তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের সেসব দ্রব্য সামগ্রীই আমদানী করার কথা যে ক্ষেত্রে তার তুলনামূলক অসুবিধা বর্তমান। এবং বাস্তবেও তাই হয়েছে। বাংলাদেশ সেসব সামগ্রীই আমদানী করছে যেখানে তুলনামূলক অসুবিধা বর্তমান । যেমন মূলধনী দ্রব্য সামগ্রী, পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী, গুড়ো দুধ, কাঁচা তুলা, লোহা, ইস্পাত, সার ইত্যাদি (সংযোজনী-১)।

তবে তুলনামূলক সুবিধা/অসুবিধা এবং উপাদানের প্রাচুর্য কোন স্থায়ী ব্যাপার নয়। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে এবং আরও অন্যান্য নানা কারণে এই তুলনামুলক সুবিধা/অসুবিধার পরিবর্তন হতে পারে। যেমন বাংলাদেশ ১৯৯৭/৯৮ সালে ৭৫ মি:মা:ড: মূল্যের সিমেন্ট আমদানী করে। ১৯৯৮/৯৯ সালে এই আমদানী এসে দাঁড়ায় ১০৫ মি:মা:ড: এবং ১৯৯৯/০০ সালে ৮০ মি:মা:ড: হয়েছে। অর্থাৎ সিমেন্টের আমদানী কমে যাচ্ছে। এর কারণ হলো বাংলাদেশ সিমেন্ট উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতার দারপ্রান্তে। দেশে বর্তমানে প্রায় ৪২টি সিমেন্ট কারখানা সিমেন্ট উৎপাদন করছে যাদের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১ কোটি মেট্রিক টন এবং আরও ৩৫ টি সিমেন্ট কারখানা আগামী ২০০২ সালের মধ্যে উৎপাদনে যাবে। দেশে বর্তমানে সিমেন্টের চাহিদা প্রায় ৫৫ লাখ টন। ১০% হারে বৃদ্ধি পেলে সিমেন্টের বার্ষিক চাহিদা দাঁড়াবে ৬০ লাখ টন। ২০০২ সালে প্রস্তাবাধীন কারখানাগুলোতে উৎপাদন শুরু হলে দেশে সিমেন্ট উৎপাদনে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হবে যা মান সম্মত করা গেলে রপ্তানী করা সম্ভব হবে।[৭] সুতরাং সিমেন্ট উৎপাদনে বাংলাদেশের তুলনামূলক অসুবিধা ক্রমেই তুলনামূলক সুবিধায় পরিণত হতে চলেছে। সিমেন্টের মত আরেকটি খাতের পরিবর্তন লক্ষণীয় সেটি হলো খাদ্য-শষ্য আমদানী খাত। এই খাতেও দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা ইতোমধ্যেই অর্জন করে ফেলেছে। তবে ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যার ফলে খাদ্য শষ্য উৎপাদন দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফলে ১৯৯৮/৯৯ সালে বাংলাদেশ ৯৯৭ মি: মা: ড: পরিমাণ খাদ্য শষ্য আমদানী করে। তবে খাদ্য শষ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে গিয়ে তৈলবীজ ও ডালের উৎপাদনের পরিমাণ দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংযোজনী - ১ এ দেখা যেতে পারে যে ১৯৯০/৯১ সালে যেখানে বাংলাদেশ মাত্র ১৬ মি:মা:ড: মূল্যের পরিমাণ তৈলবীজ আমদানী করেছে সেখানে এই আমদানী ১৯৯৯/০০ সালে বেড়ে হয়েছে ৯০ মি:মা:ড:। বাংলাদেশের সিংহভাগ আমদানী হয়ে থাকে নগদ আকারে। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে মোট আমদানী ব্যয় ছিল ৮০৪৩ মি:মা:ড: যার ৭২.৩ শতাংশ হয়েছে নগদ আকারে।

৭। বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচার এসোসিয়েশনের সভাপতি আহমেদ আকবর সোবহান দৈনিক, প্রথম আলো, ২২শে আগষ্ট, ২০০১ এ এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্যগুলো দিয়েছেন। তিনি অবশ্য সিমেন্ট শিল্পের স্বার্থেই এই শিল্পে নতুন বিনিয়োগ বন্ধের দাবী জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের আমদানী বাণিজ্যের যেদিকে লক্ষ্য করা যেতে পারে, সেটি হলো রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকার (ইপিজেড) আমদানী ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ ব্যবহার করে শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৮০ সাল হতে দেশে রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে এক বিশেষ প্রক্রিয়া চালু করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মংলা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ইপিজেড স্থাপনের পরিকল্পনা থাকলেও এদের মধ্যে ১৯৮৩-৮৪ সাল হতে চট্টগ্রামে এবং ১৯৯৩-৯৪ সাল হতে ঢাকা ইপিজেডের কার্যক্রম শুরু হয়। তবে খুলনা ইপিজেড এখনও চালু হয়নি।

এক হিসাব অনুযায়ী জুন, ২০০০ পর্যন্ত সময়ে চট্টগ্রাম ইপিজেড অঞ্চলে ৯৮ টি ও ঢাকা ইপিজেড অঞ্চলে ৪২ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। এর মধ্যে এ-টাইপ (সম্পূর্ণ বিদেশী বিনিয়োগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান), বি-টাইপ (দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান) এবং সি-টাইপ (সম্পূর্ণ দেশী বিনিয়োগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান) শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথাক্রমে ৮৭, ২৬ ও ২৭ টি। সারণী -৩ এ দেখা যায় যে, এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে আমদানী চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯০-৯১ সালে যেখানে ইপিজেড কর্তৃক আমদানীর পরিমাণ ছিল মাত্র ৪০ মি:মা:ড: সেখানে ১৯৯৯/২০০০ অর্থবছরে এই আমদানী বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬৫ মি:মা:ড:।[৮]

৪.০ বাংলাদেশের আমদানী বাণিজ্যের অংশীদারসমূহ

বাংলাদেশের সরবরাহকারী দেশসমূহের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতই বাংলাদেশের প্রধান সরবরাহকারী দেশ। বাংলাদেশ ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ভারত থেকে সর্বাধিক মালামাল আমদানী করে । নগদ এবং ওয়েজ আর্নার্স ফান্ড এর অধীনে ভারত থেকে উক্ত অর্থ বছরে ৪১৬৮.৬ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করা হয়েছে যা মোট আমদানী ব্যায়ের শতকরা ১৩.৬ ভাগ । বিগত অর্থ বছরে এই দেশ হতে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৫৯০৩.১ কোটি টাকা যা ছিল মোট আমদানী ব্যয়ের ২০.৭%।[৯] উক্ত দেশ হতে প্রধান প্রধান আমদানীকৃত দ্রব্য সামগ্রী হলো: সব ধরনের তুলা, সুতা ও সুতী বস্ত্র, খাদ্য শষ্য, পরিবহণ সরঞ্জাম ও এর যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রপাতি, কফি, মশলা, রাবার ও রাবার জাতীয় সামগ্রী চুন, সিমেন্ট প্রভৃতি ছাড়াও আরও নানা ধরণের পণ্য সামগ্রী। ভারত থেকে আমদানীর মূল কারণ হলো বাংলাদেশের সাথে ভারতের যোগাযোগ সুবিধা। যে কোন পণ্য সামগ্রী স্থলপথে খুবই কম খরচে এবং কম সময়ে একমাত্র ভারত থেকেই আমদানী করা সম্ভব । পৃথিবীর খুব কম দেশই এরকম সুবিধা ভোগ করতে পারে। এমনকি ভারত থেকে কোন কোন পণ্য আমদানীর জন্য কোন পরিবহণ ব্যয়ভার আমদানীকারককে বহন করতে হয় না। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের আমদানীকারকগণ বাস-ট্রাকের চেসিসে শুধুমাত্র চালকের আসন সেট করে সেটিকে সরাসরি চালিয়ে বাংলাদেশে এনে থাকেন।

৮। বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক আমদানী ব্যয় ১৯৯৯/০০ (ঢাকা পরিসংখ্যান বিভাগ) পৃঃ xv

৯। পূর্বোক্ত।

চিত্র-১
বাংলাদেশে প্রধান প্রধান সরবরাহকারী দেশসমূহ

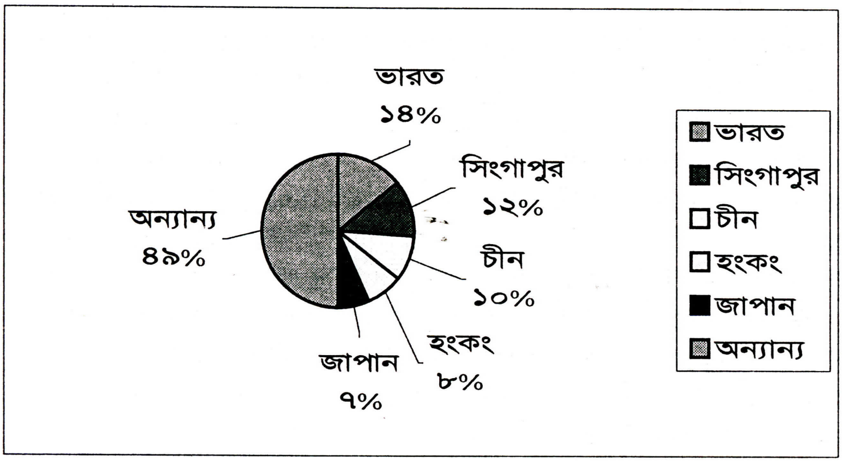

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রপ্তানী আয় ১৯৯৯/০০*

চিত্র-১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সরবরাহকারীদেশ সমূহের একটি তুলনামূলক অবস্থান দেখানো হয়েছে।

চিত্র-১ এ দেখা যাচ্ছে যে ভারতের পরেই দ্বিতীয় সর্বাধিক সরবরাহকারী দেশ হিসেবে সিংগাপুরের স্থান। ১৯৯৯/০০ অর্থ বছরে সিংগাপুর হতে ৩৫১৪.২ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করা হয়েছে যা ছিল মোট আমদানী ব্যয়ের শতকরা ১১.৫ ভাগ। সিংগাপুর থেকে আমদানীকৃত প্রধান প্রধান পণ্য সামগ্রী হলো খনিজ জ্বালানী, খনিজ তেল, এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যাদি।[১০] বাংলাদেশে পণ্য সরবরাহকারী হিসেবে তৃতীয় স্থানে রয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে উক্ত দেশ হতে ২৭৬২ কোটি টাকার (যা মোট আমদানীর প্রায় শতকরা ৯ ভাগ) তুলা, সুতী বস্ত্র বয়লার, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ইত্যাদি আমদানী করা হয়।[১১]

বাংলাদেশে চতুর্থ বৃহত্তম সরবরাহকারী দেশ হচ্ছে হংকং। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে এই দেশ হতে ২২৮৬.২ কোটি টাকার (যা মোট আমদানী ব্যয়ের শতকরা ৭.৫ ভাগ) তুলা, সুতী বস্ত্র ও সুতী, বিভিন্ন ধরনের ফেব্রিক্স ইত্যাদি আমদানী করা হয়।[১২]

বাংলাদেশে পঞ্চম বৃহত্তম পণ্য সরবরাহকারী দেশ হলো জাপান। বাংলাদেশ জাপান থেকে প্রধানত: লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রী আমদানী করে থাকে। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাপান থেকে ১৯৯৩.৩ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করে যা

১০। পূর্বোক্ত,পৃঃ vi.
১১। পূর্বোক্ত।
১২। পূর্বোক্ত, পৃঃ viii.

ছিল মোট আমদানী ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৬.৫ ভাগ। ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে জাপান হতে আমদানীর পরিমাণ ছিল ১২৬৫.৮ কোটি টাকা এবং তা ছিল মোট আমদানী ব্যয়ের শতকরা ৪.৪ ভাগ।[১৩]

অধ:ক্রমানুসারে অন্যান্য দেশ হতে আমদানীর পরিমাণ বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশ ১৯৯৯/২০০০ অর্থবছরে তাইওয়ান থেকে ১৯৪৩.৩ কোটি, কোরিয়া থেকে ১৫২৬.৭ কোটি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১০২৫ কোটি, অষ্ট্রেলিয়া থেকে ৯৬৬ কোটি, ইন্দোনেশিয়া থেকে ৮১৩.৩ কোটি, যুক্তরাজ্য থেকে ৭৯৮.৬ কোটি, থাইল্যান্ড থেকে ৭৭৪.২ কোটি, সৌদি আরব থেকে ৭০৮ কোটি, জার্মানী থেকে ৬০১.৮ কোটি, সুইজারল্যান্ড থেকে ৫৪৮.৯ কোটি, মালয়েশিয়া থেকে ৫৪০.৮ কোটি, আর্জেন্টিনা থেকে ৪৩১.৮ কোটি এবং পাকিস্তান থেকে ৪২০.২ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করেছে।[১৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ যে সব দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক অসুবিধা বর্তমান সেসব দ্রব্য সামগ্রী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানী করে থাকে এবং কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক অসুবিধা দূর হয়ে তুলনামূলক সুবিধা দেখা দিতে শুরু করেছে।

৫.০ বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্য এবং বাণিজ্য তত্ত্বসমূহ

এবার বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে । তত্ত্ব অনুযায়ী একটি দেশের যে সব দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা বর্তমান সে সব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করবে বা যে সব উপাদান প্রচুর সে দেশ সেসব উপাদান ব্যবহারপূর্বক দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানী করবে ।

বাংলাদেশ রপ্তানীখাতের অধিক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদী (১৯৯৭-২০০২) রপ্তানী নীতি ঘোষণা করেছে এবং এ ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক ফলাফল আশা করা হচ্ছে। সারণী-৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, আসলেই বাংলাদেশে যেসব দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা বর্তমান সেসব দ্রব্য সামগ্রীই রপ্তানী করছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় কৃষিজাত প্রাথমিক পণ্য সামগ্রী রপ্তানী করছে আবার দেশে প্রচুর অদক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্যের কারণে শ্রম নিবিড় গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ ঘটেছে এবং বর্তমানে রপ্তানীর প্রায় সিংহভাগই আসছে এই শ্রম-নিবিড় খাত থেকে (সংযোজনী-২)।

সারণী-৪ এ দেখা যায় যে, ১৯৯০/৯১ সালে তৈরী পোষাক খাত থেকে এসেছে ৭৩৬ মি:মা:ড: যা ছিল মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে খাত থেকে আয় এসেছে ৩০৮৩ মি:মা:ড: যা মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা প্রায় ৫৪ ভাগ। মোট শিল্পজাত পণ্য থেকে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পাবার কারণও কিন্তু এই তৈরী পোষাক খাত ।

১৩। পূর্বোক্ত,পৃঃ viii.

১৪। পূর্বোক্ত। পৃঃ xviii-xix

সারণী-৪
এক নজরে বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

প্রধান রপ্তানী পণ্য সমূহ এবং রপ্তানী আয়	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০
ক. প্রাধমিক দ্রব্য সমূহ	৩০৭	২৬৮	৩১৪	৩৪৭	৪৫২	৪৭৬	৫২৬	৫০২	৪২২	৪৬৯
তৈরী পোষাক	৭৩৬	১০৬৪	১২৪০	১২৯২	১৮৩৫	১৯৪৯	২২৩৮	২৮৪৩	২৯৮৫	৩০৮৩
নীট ওয়্যার	১৩১	১১৯	২০৫	২৬৪	৩৯৩	৫৯৮	৭৬৩	৯৪০	১০৩৫	১২৭০
অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	৫৪৪	৫৪৩	৬২৪	৬৩১	৭৩৯	৮৬১	৯০০	৮৮৭	৮৮২	৯৩০
মোট শিল্পজাত পণ্য	১৪১১	১৭২৬	২০৬৯	২১৮৭	৩০২১	৩৪০৮	৩৯০১	৪৬৭০	৪৯০২	৫২৮৩
মোট রপ্তানী আয় (ক+খ)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮৪	৪৪২৭	৫১৭২	৫৩২৪	৫৭৫২
শতকরা পরিবর্তন	১২.৭	১৬.১	১৯.৫	৬.৩	৩৭.১	১১.৮	১৪.০	১৬.৮	২.৯	৮.০৩

বাংলাদেশ সরকার , *অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০*, পৃ: থেকে সংকলিত ।

৫.১ বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের অংশীদারসমূহ

বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের ক্রেতার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ক্রেতা হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে রয়েছে যেখানে বাংলাদেশ ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে প্রায় ৭৮৫২.৪ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করেছে যা ছিল মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ৩৬.৯ ভাগ।[১৫] যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যসমূহের মধ্যে তৈরী পোষাক, পাটজাত দ্রব্য, মাছ, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য এবং কাঁচাপাট ইত্যাদি ছিল প্রধান। তবে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রধানতম রপ্তানীপণ্য ছিল তৈরী পোষাক, যা থেকে এককভাবে আয় হয়েছে ৬৬৭৯.৯ কোটি টাকা, যা যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ৮৫ ভাগ।[১৬] বাংলাদেশী পণ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা হলো জার্মানী। ৯৯/০০ অর্থবছরে এই দেশে বাংলাদেশ ২৫৭১.১ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করেছে যা মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ১২.২ ভাগ।[১৭]

বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হলো যুক্তরাজ্য। এই দেশ ৯৯/০০ অর্থবছরে বাংলাদেশ হতে ১৯৪২.১ (মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ৯.১ ভাগ) কোটি টাকার তৈরী পোষাক, মাছ, চা, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, শাক-সব্জি, ফল ইত্যাদি আমদানী করে। ফ্রান্স বাংলাদেশ থেকে ১৩৬৩.২ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের পণ্যের প্রধান প্রধান ক্রেতা দেশগুলোর একটি তুলনামূলক অবস্থান চিত্র-২ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

১৫। বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রপ্তানী আয় ১৯৯৯/০০ (ঢাকা-পরিসংখ্যান বিভাগ) পৃঃ x.

১৬। পূর্বোক্ত।

১৭। পূর্বোক্ত।

চিত্র-২
বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান ক্রেতা

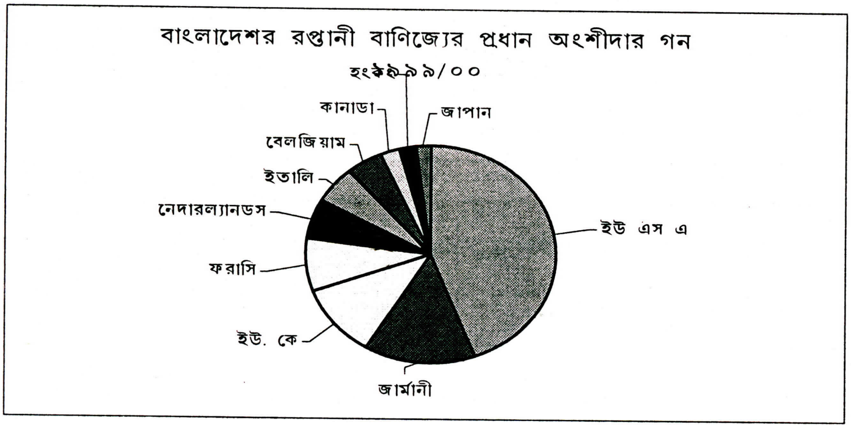

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রপ্তানী আয়* ১৯৯৯/০০ পৃ: x-xi

৬.০ বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের সাম্প্রতিক সমস্যাসমূহ

নানা কারণে বাংলাদেশের রপ্তানীদ্রব্যের বাজার ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনে যে সমস্ত তুলনামূলক সুবিধা বর্তমান ছিল তা দৃশ্যত তুলনামূলক অসুবিধায় পরিণত হতে চলেছে। সাম্প্রতিক আফগান যুদ্ধের ফলে জুলাই- আগষ্ট মাস জুড়ে কারখানাগুলো যখন প্রচন্ডভাবে ব্যস্ত থাকে বিভিন্ন ধরনের পোষাক তৈরীর কাজে, সেই একই সময়ে এ বছর (২০০১ সালে) পোষাক রপ্তানী আয় আশংকাজনক হারে প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছে।[১৮] এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরী পোষাকের অন্যতম প্রধান ক্রেতা। বাংলাদেশ তার মোট তৈরী পোষাক রপ্তানীর শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ করে থাকে যুক্তরাষ্ট্রে। বস্তুত মার্কিন অর্থনীতির মন্দাভাবের প্রভাবে পড়েছে বাংলাদেশের তৈরী পোষাক খাত। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে হামলার জের বাংলাদেশেও এসে পড়েছে। এর ফলে ইতোমধ্যে সাময়িকভাবে ২০০ এর মত তৈরী পোষাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।তবে এখন পর্যন্ত ইউরোপে বাংলাদেশ রপ্তানী করতে পারছে এইটুকুই যা সান্ত্বনা। দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে বিভিন্ন ক্যাটাগরির তৈরী পোষাকের দাম ব্যপকহারে পড়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, গত বছর যে পণ্যের দাম ছিল ৯০ ডলার এবার তা ১২ ডলারে নেমে এসেছে।[১৯]

তাছাড়া, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানী পণ্যগুলো প্রচন্ড প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত বছর আফ্রিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের প্রায় ৭২ টি দেশকে তৈরী পোষাক রপ্তানীতে শুল্ক ও কোটা মুক্ত সুবিধা দিয়েছে। পোষাক

১৮। দৈনিক প্রথম আলো, (ঢাকাঃ ২২শে আগষ্ট, ২০০১)
১৯। পূর্বোক্ত।

শিল্পের সবচেয়ে বড় রপ্তানীকারক দেশ হওয়া সত্বেও বাংলাদেশ সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রপ্তানী বাজারে এবার বিশেষ সুবিধা পেতে যাচ্ছে ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ৪২ টি পণ্যকে সেদেশে শুল্কমুক্ত রপ্তানীর সুবিধা দিয়েছে।[২০] এতে করে বাংলাদেশ নতুন চাপের মুখে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই চাপ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার টাকার অবমূল্যায়ন করছে। ১৯৯৬ সালের জুলাই থেকে ২০০১ সালের মে পর্যন্ত ডলারের বিপরীতে টাকা ১৮ বার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।[২১] যদিও রপ্তানী প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবমূল্যায়ন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কতটুকু ফলদায়ক তা ভাবার বিষয়।

বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্য আরেকটি বিশেষ কারণে হুমকির সম্মুখীন, আর তা হলো তৈরী পোষাকের উপর নির্ভরশীলতা। এই নির্ভরতার কুফল বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ভোগ করতে শুরু করেছে। গত ২২ শে নভেম্বর ২০০১ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নও বাংলাদেশকে তার রপ্তানী পণ্যের পরিধি বাড়াতে এবং তৈরী পোষাকের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে পরামর্শ দিয়েছে। পণ্যের বিচিত্রতা এবং বহুমুখীতা আনা এবং নতুন নতুন বাজার খুজে পাবার ওপরই যে বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ তা এক কথায় সকলকেই স্বীকার করতে হবে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সব পণ্য একদিনে বাজার পায়না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান রপ্তানী পণ্য তৈরী পোষাক থেকে প্রাপ্ত আয় একদা বিবিধ খাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলাদেশের বর্তমান ধ্বসে যাওয়া রপ্তানী বাণিজ্যকে চাঙ্গা করতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত জরুরী। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টোটা হচ্ছে। বিশ্ব যেখানে অধিকহারে মুক্ত হবার অঙ্গীকার করছে সেখানে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যের প্রবেশ সংকুচিত করবার প্রয়াস নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ভারত বাংলাদেশের ব্যাটারী রপ্তানীর ওপর এন্টি ডাম্পিং শুল্ক দিচ্ছে যা সাপটা চুক্তির ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের আওতায় পড়েনা। অথচ বাংলাদেশ ভারত থেকেই সর্বাধিক দ্রব্য সামগ্রী আমদানী করে থাকে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের বৈধ বাণিজ্য ঘাটতি বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৫২ কোটি টাকা। ২০০০/২০০১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ভারত থেকে মোট ৬ হাজার ৩৮৮ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করেছে অপরদিকে রপ্তানী করেছে মাত্র ৩৩১ কোটি টাকার।[২২] প্রায় তিন বছর আগে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের নিকট বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশের ২৫ টি পণ্য ভারতের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের প্রস্তাব করলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তা মেনে নিলেও তা ভারত আজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেনি।[২৩]

২০। পূর্বোক্ত।
২১। পূর্বোক্ত।
২২। দৈনিক ইত্তেফাক (ঢাকাঃ ২৪শে ডিসেম্বর, ২০০১)।
২৩। পূর্বোক্ত।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, এশিয়া উইকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতের রপ্তানী আয় ছিল ৪ হাজার ৪৫০ কোটি মার্কিন ডলার যা সার্ক দেশগুলোর মধ্যে প্রথম। অন্যদিকে বাংলাদেশ যার অবস্থান সার্কদেশসমূহের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ তার রপ্তানী আয় মাত্র ৫৮০ কোটি মার্কিন ডলার।[২৪] অর্থাৎ ভারতের সাথে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার কোন প্রশ্নই আসে না অথচ তারপরেও বাংলাদেশকে ভারত তার বৃহৎ আয়তনের সুবিধা ভোগ থেকে বঞ্চিত করছে। তবে একথা সত্য যে, বাংলাদেশ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে বাণিজ্য পরিধি বাড়ানোর সুযোগ পেলে বাংলাদেশ এবং ভারত উভয় দেশই লাভবান হবে।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যে বড় ধরণের ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এই ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের তৈরী পোষাক, চা, হিমায়িত খাদ্য, পাট ও চামড়াসহ রপ্তানীর প্রধান ১৩ খাতের আয় অনেক কমে গেছে। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী গত অক্টোবর মাসে রপ্তানীতে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩৩ দশমিক ২০ শতাংশ ঘাটতি পড়েছে আর গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ দশমিক ৪১ শতাংশ রপ্তানী হ্রাস পেয়েছে।[২৫]

৭.০ উপসংহার

রপ্তানী বাণিজ্যের এই ক্রমবর্ধমান ঘাটতি হ্রাসে এবং দেশের রপ্তানীমুখী শিল্পসমূহের উন্নয়নে কার্যকর এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান, পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, এবং নতুন নতুন ফ্যাশন এবং ডিজাইনের উদ্ভাবন করতে হবে। তাছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য তৈরী পোষাক শিল্পের জন্য শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ (Backward linkage) শিল্প গড়ে তোলা একান্ত জরুরী। এর পাশাপাশি সম্ভাবনাময় বেশ কিছু খাত যেমন সফটওয়্যার এবং ডাটা প্রসেসিং, চামড়া শিল্প, জুয়েলারী, প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, পোলট্রি খামার ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে রপ্তানী পণ্যে বহুমুখীতা আনয়ন জরুরী। তাছাড়া সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ফরোয়ার্ড লিংকেজ (Forward linkage) শিল্প স্থাপন করেও রপ্তানী পণ্যে বিচিত্রতা আনয়ন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ হিমায়িত খাদ্য দেশেই প্রসেস করে রেডী ফুড হিসেবে রপ্তানী করা যেতে পারে। তাছাড়া কিছু অপ্রচলিত পণ্য যেমন সুগন্ধি চাল এবং পান পাশ্ববর্তী দেশসমূহে সরকারি উদ্যোগে রপ্তানীর চেষ্টা করা যেতে পারে। সর্বোপরি বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য মিশনগুলোকে রপ্তানী পণ্যের বাজার সংরক্ষণ এবং নতুন বাজারের সন্ধানে কার্যকর এবং দক্ষ ভূমিকা নিতে হবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানী বাড়াতে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বৈদেশিক বাণিজ্য মিশনগুলোকে পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[২৬] একই সঙ্গে নতুন নতুন তুলনামূলক সুবিধা খুজে দেখাও একান্ত জরুরী।

২৪। দৈনিক প্রথম আলো, (ঢাকাঃ ২২শে আগষ্ট, ২০০১)।
২৫। দৈনিক ইত্তেফাক (ঢাকাঃ ২৪শে ডিসেম্বর, ২০০১)।
২৬। দৈনিক প্রথম আলো, (ঢাকাঃ ২৫শে আগষ্ট, ২০০১)।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে যত তত্ত্বকথাই বলা হোক না কেন এই বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণ একান্ত জরুরী । এখানে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সরকারকে সমাজের সর্বস্তরে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে যাতে বিদেশী বিনিয়োগকারী এবং রপ্তানীকারকগণ আস্থা খুঁজে পান। আর এভাবেই হয়ত বাংলাদেশ বর্তমান সংকট কাটিয়ে উঠবে।

সংযোজনী - ১

বাংলাদেশের আমদানী বাণিজ্যের একটি প্রবাহ চিত্র (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

প্রধান আমদাণীকৃত দ্রব্য সামগ্রী	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০
১.খাদ্য শষ্য চাল গম	২৯৭ -- ২৯৭	২৬৫ ৫ ২৬০	১৭৬ --- ১৭৬	১৫১ ১০ ১৪১	৪৭৬ ২২০ ২৫৬	৫৮৬ ৩৫৮ ২২৮	১৮৪ ২৮ ১৫৬	৩৬৯ ২৪৭ ১২২	৯৯৭ ৬৮০ ৩১৭	৩৮১ ১১৫ ২৬৬
২. খাদ্য ব্যতিত অন্যান্য দ্রব্য	৩১৭৩	৩১৯৮	৩৮১০	৩৯১৯	৫১৬১	৬১০০	৬৫৭৬	৬৬৬২	৬৫২৫	৭৩৫৭
দুগ্ধজাতীয় পণ্য	৭২	৬৩	৬৫	৩৭	৪১	৫৩	৫৩	৪৫	৫৬	৬০
মশলা	১৯	১৫	২৪	২২	১৬	২৩	১০	১০	২৭	১৮
তৈল বীজ	১৬	৯	৩৫	৪০	৮০	৮৯	৬২	৯৩	১০০	৯০
ভোজ্য তেল	১৫৩	১৬৩	১৫২	১১৭	২২০	১৭৯	২১৬	২১৬	২৮৭	২৫৬
নারিকেল তেল	৩	১১	২	২	৪	৫	৫	৬	৫	৬
চিনি	--	১	১৩	১৩	৩২	৬	৪৯	২৯	৪২	৩০
সিমেন্ট	৭৫	৭৭	১১৫	১০০	১১৬	১৭১	১৫৬	১৫২	১০৫	৮০
ক্রুড পেট্রোলিয়াম	১৪৪	১৫২	১৮১	১১৬	১৭৭	১৬৬	১৭৪	১৪০	১১৮	২৩২
পিওএল	২০৪	১৬৮	১৭২	১৬৮	২০৬	২৯০	৩৪১	২৯৫	২৭০	৪০৬
কেমিক্যালস	১২৫	১০১	১২৬	১৪৪	১৫৫	২০১	২৫৭	২৪৮	২৫০	২৭৮
ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য	৯	২৫	১৩	১৫	১৬	২০	২২	২৭	২৯	২৭
সার	৯০	১১৭	১৩১	১৩৫	১৪২	৯৭	১৫০	১০৮	১২০	১৪০
ডাইং , ট্যেনিং ইত্যাদি	২০	২২	৩৪	৩৬	৫০	৫৫	৬২	৬৬	৬৬	৭১
কাঁচা তুলা	৬৮	৭১	৮২	৭২	১৩৫	১৮৫	১৯৫	২০৭	২৩৩	২৭৭
ইয়ার্ন	৫২	৯২	১২৭	১৬৮	২০০	২৯৬	৩৯৫	৩২৭	২৮৩	৩০০
টেক্সটাইল ও অন্যান্যা	৪১১	৫১২	৬৮৭	৮৪১	১০২৫	১০৪৩	১০৯৮	১২৬৪	১১০৯	১১৫৩
ষ্ট্যাপল ফাইবার	১২	১৯	৩১	৩১	৪০	৪৩	৪৫	৪৮	৩৯	৪৩
লৌহ ও ইস্পাত	৯৭	৯৯	১০৬	১৩০	২০৬	৩২২	৪৩৭	৩৯১	৩৪৫	৩৯৩
মূলধনী দ্রব্যাদি	১২৩১	১২৮৯	১৩৪৬	১২৯৯	১৬৮৮	১৯৬৮	১৯৩৭	২০৭২	১৯৬৯	২১৩৩
অন্যান্য	৩৭২	১৯২	৩৬৮	৪৩৩	৬১২	৮৮৮	৯১২	৯১৮	১০৭২	১৩৬৪
সাব টোটাল	৩৪৭০	৩৪৬৩	৩৯৮৬	৪০৭০	৫৬৩৭	৬৬৮৬	৬৭৬০	৭০৩১	৭৫২২	৭৭৩৮
ইপিজেড	৪০	৬৩	৮৫	১২১	১৯৭	২৬১	৪০২	৪৯৩	৪৯৬	৬৬৫
মোট	৩৫১০	৩৫২৬	৪০৭১	৪১৯১	৫৮৩৪	৬৯৪৭	৭১৬২	৭৫২৪	৮০১৮	৮৪০৩

উৎস ঃ বার্ষিক আমদানী ব্যয় ১৯৯৯-২০০০, পৃষ্ঠা XLI

সংযোজনী-২

সংযোজনী -২
বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের একটি প্রবাহ চিত্র (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমুহ	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০
ক)প্যাথমিক পন্যসমুহ										
১। কাচা পাট	১০৪	৮৫	৭৪	৫৭	৭৯	৯১	১১৬	১০৮	৭২	৭২
২। চা	৪৩	৩২	৪১	৩৮	৩৩	৩৩	৩৮	৪৭	৩৯	১৮
৩। হিমায়িত খাদ্য	১৪২	১৩১	১৬৫	২১১	৩০৬	৩১৪	৩২১	২৯৪	২৭৪	৩৪৪
৪। কৃষিজ পণ্য	৮	১০	১৫	১৫	১৩	২২	২৯	৩৯	২২	১৮
৫।অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমুহ	১০	১০	১৯	২৬	২১	১৬	২২	১৪	১৫	১৭
মোট প্রাধমিক দ্রব্য সমুহ (১-৪)	৩০৭	২৬৮	৩১৪	৩৪৭	৪৫২	৪৭৬	৫২৬	৫০২	৪২২	৪৬৯
খ. শিল্পজাত পণ্য										
৬। পাটজাত দ্রব্য সমূহ	২৯০	৩০১	২৯২	২৮৪	৩১৯	৩২৯	৩১৮	২৮১	৩০৪	২৬৬
৭। চামড়া	১৩৪	১৪৪	১৪৮	১৬৮	২০২	২১২	১৯৫	১৯০	১৬৮	১৯৫
৮। ন্যাপথা ফার্নেস অয়েল এবং বিটুমিন	৩২	৮	৩৭	১৬	১৪	১১	১৬	১১	৫	১১
৯। তৈরী পোষাক	৭৩৬	১০৬৪	১২৪০	১২৯২	১৮৩৫	১৯৪৯	২২৩৮	২৮৪৩	২৯৮৫	৩০৮৩
১০। নীট ওয়্যার	১৩১	১১৯	২০৫	২৬৪	৩৯৩	৫৯৮	৭৬৩	৯৪০	১০৩৫	১২৭০
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	৪০	২৫	৫৫	৫৪	১০৮	৯৮	১০৮	৭৪	৭৯	৯৪
১২। কাগজ ও সহজাত দ্রব্য	৫	৬	৩	--	--	--	--	--	--	--
১৩।হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৫	৯	৫	৭	৬	৬	৬	৬	৮	৫
১৪। ইনিজনিয়রীং দ্রব্য	৬	৯	১৮	৪	১০	১৩	১৬	২০	১১	৮
১৫। অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য	৩২	৪১	৬৬	৯৮	১৩৪	১৯১	২৪১	৩০৫	৩০৭	৩৫১
মোট শিল্পজাত পণ্য (৬-১৫)	১৪১১	১৭২৬	২০৬৯	২১৮৭	৩০২১	৩৪০৮	৩৯০১	৪৬৭০	৪৯০২	৫২৮৩
মোট রপ্তানী আয় (ক+খ)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮৪	৪৪২৭	৫১৭২	৫৩২৪	৫৭৫২
শতকরা পরিবর্তন	১২.৭	১৬.১	১৯.৫	৬.৩	৩৭.১	১১.৮	১৪.০	১৬.৮	২.৯	৮.০৩

উৎসঃ বাংলাদেশ সরকার, *অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০০১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Enders, Walter and Harvey E. Lapan. *International Economics: Theory and Policy.* New Jersy: Prentice Hill, Inc., 1987.

Ricardo, David. *The Principles of Political Economy and Taxation.* Homewood III: Irwin, 1963.

Salvatore, Dominick. *Theory and Problems of International Economics 2nd ed.* New York: Mc Graw Hill, 1984.

Salvatore,Diminick. *International Economics.* New York: Macmilan Publishing Company, 1983.

Smith, Adam. *The Wealth of Nations.* New York: The Modern Library, 1934.

আইয়ুব, মিয়া মুহাম্মদ এবং আবুল কাসেম হায়দার (সংগ্রহ ও সংকলন)। *বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নীতিমালা।* ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০০।

দৈনিক প্রথম আলো ঢাকা: ২৫ শে আগষ্ট, ২০০১।

দৈনিক ইত্তেফাক ঢাকা: ২৪ শে ডিসেম্বর, ২০০১।

দৈনিক প্রথম আলো। ঢাকা: *২২ শে আগষ্ট, ২০০১।*

বাংলাদেশ ব্যাংক। *বার্ষিক আমদানী ব্যয় ১৯৯৯/০০* । ঢাকা:পরিসংখ্যান বিভাগ।

বাংলাদেশ ব্যাংক। *বার্ষিক রপ্তানী আয় ১৯৯৯/০০।* ঢাকা:পরিসংখ্যান বিভাগ ।

বাংলাদেশ সরকার, *অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১* । ঢাকা: অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০০১।

লেখকদের জন্য জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা (ইতোপূর্বেকার ষান্মাসিক প্রশাসন সমীক্ষা) বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাৎসরিক বাংলা সাময়িকী। প্রতি বাংলা সনের কার্তিক মাসে এ'টি প্রকাশিত হয়। এতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণামূলক নিবন্ধ, গবেষণা টীকা ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়ে থাকে। তবে লোক-প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক লেখা অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

- প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্ণাল বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি, এ মর্মে প্রবন্ধ জমা দেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে।
- লেখা মান সম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মূল পান্ডুলিপির সঙ্গে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবেঃ
  বাংলা কম্পোজ ঃ "প্রশিকা শব্দ (লিপি নরমাল)" ফন্ট
  ইংরেজী কম্পোজঃ "টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট।
- প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিস্কেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ করতে হবে।
- প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- মূল কপিসহ পান্ডুলিপির ২(দুই) প্রস্ত (পরিচ্ছন্ন কপি) সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদা কাগজে (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।
- ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজীতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পাদটিকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থ স্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খন্ড ও ইস্যু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে।
- লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ২ কপি ও প্রবন্ধের ২৫ কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন।
- প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিস্কেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।
- মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।

প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং মেসার্স ইছামতি অফসেট প্রেস, ১/১ ডিআইটি রোড, হাজীপাড়া, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার তালিকা

১। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
(যান্মাষিক বাংলা জার্নাল) টাঃ ২০/-
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা টাঃ ৪০/-

২। Bangladesh Journal of Public Administration
Vol-1, No. 1&2
Vol-2, No. 1&2
Vol-3, No. 1&2 টাঃ ২০/-
Vol-4, No. 1&2 টাঃ ৪০/-
Vol-5, No. 1&2
Vol-6, No. 1&2
Vol-7, No. 1&2

৩। Post Entry Training in Bangladesh Civil Service টাঃ ৪০/-

৪। Career Planning in Bangladesh টাঃ ১২০/-

৫। Sustainability of Higher Agricultural Education in Bangladesh: A Case Study of Gonoshasthaya Kendra টাঃ ৪০/-

৬। Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of RD-1 Project in Bangladesh টাঃ ৪০/-

৭। বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিসে মহিলা টাঃ ১২০/-

৮। Sustainability of Primary Education Project: A Case Study of Universal Primary Education Project in Bangladesh টাঃ ৪০/-

৯। Co-ordination in Public Administration in Bangladesh টাঃ ১০০/-

১০। (ক) Decentralization & People's Participation in Bangladesh (board binding) টাঃ ১৫০/-
(খ) Decentralization & People's Participation in Bangladesh (Paper back) টাঃ ১২৫/-

১১। প্রবীন প্রশাসকের অভিজ্ঞতা টাঃ ৭০/-

১২। Social and Administrative Research in Bangladesh টাঃ ৭০/-

১৩। Problems of Municipal Administration টাঃ ২৮/-

১৪। Bangladesh Public and Senior Civil Servants টাঃ ৫০/-

১৫। প্রশাসনের মূলনীতি টাঃ ১৮/-

১৬। অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ টাঃ ৬/৫০

১৭। সরকারী **কর্মকাণ্ডে** মহিলা নির্বাহী বিকাশে সমস্যা টাঃ ৬/৫০

১৮। প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি টাঃ ৬/৫০

১৯। Famine Manual টাঃ ৭/-

২০। The Deputy Commissioner in East Pakistan টাঃ ১৬/-

২১। Social Change and Development Administration in South Asia টাঃ ৪৫/-

২২। Hospital Administration টাঃ ১৮/-

২৩। District Administration in Bangladesh টাঃ ২২/-

২৪। Hand Book for the Magistrates টাঃ ১০০/-

২৫। লোক-প্রশাসন সাময়িকী
১ম সংখ্যা-১৫তম সংখ্যা টাঃ ১৫/-

২৬। সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি টাঃ ১২৫/-

২৭। Bureaucracy in Bangladesh Perspective টাঃ ৫০০/-

২৮। Limiting the Rule of State Prescription of the World Bank and the Bangladesh Economy টাঃ ১০০/-

২৯। The Assessment of EL. Nino Impacts and Responses টাঃ ২৫০/-

আরো তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।